শহীদ রফিক উদ্দিন আহমেদ

(১৯২৬-১৯৫২)

ভাষার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে যে সন্তান সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঋণী করেছেন, মানিকগঞ্জকে গৌরবান্বিত করেছেন তাঁর নাম রফিক উদ্দিন আহমেদ। তিনি ১৯২৬ সালের ৩০ শে অক্টোবর মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার পারিল বলধারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মায়ের নাম রাফিজা খাতুন। তিনি ১৯৪৯ সালে বায়রা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময়ে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তারপর আসে বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারী। ঐদিন পাক সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিল করার সময় তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে) রফিকই প্রথম গুলিবিদ্ধ হন। তাই বলা যায় তিনিই ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। রফিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালে তিনি পারিল-বলধারা যুবক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি এখন শহীদ রফিক হয়ে পনের কোটি মানুষের অন্তরে বিরাজমান। তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানে।

খান আতাউর রহমান

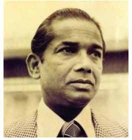

(ডিসেম্বর ১১, ১৯২৮ - ডিসেম্বর ১, ১৯৯৭)

যিনি **খান আতা** নামে বহুল পরিচিত, ছিলেন একজন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার, এবং প্রযোজক। তার অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র *জাগো হুয়া সাভেরা*। চলচ্চিত্রকার এহতেশাম পরিচালিত *এ দেশ তোমার আমার* তার অভিনীত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র। *নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা* (১৯৬৭) এবং *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্র দিয়ে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে ১ম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। পরে *এখনো অনেক রাত* (১৯৯৭) চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন।

মমতাজ

(পুরো নাম: *মমতাজ বেগম*) একজন জনপ্রিয় বাংলা লোকগানের সংগীত শিল্পী এবং জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য।[২] ভিন্ন ধারার গান পরিবেশনের কারণে *মিউজিক কুইন* বা *সুর সম্রাজ্ঞী* নামেও তিনি বহুল পরিচিত।

কর্মজীবন[সম্পাদনা]

দুই দশকের বেশি তার পেশাদারী সংগীত জীবনে ৭০০টির বেশি একক অ্যালবাম প্রকাশ পায়। ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদ সদস্য মনোনীত হোন।[৩] লোক গানের শিক্ষক আব্দুর রশীদ সরকার সাথে তার বিবাহ হয়। প্রথম জীবনে বাবা মধু বয়াতি, পরে মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান এবং শেষে আব্দুর রশীদ সরকারের কাছে গান শেখেন।

মমতাজ সারাদেশে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহন করেন। তাছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অনেক দেশেই সংগীত অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন এবং তার গান ব্যাপকভাবে সমাদৃত। বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার গানের জুড়ি নেই, বিশেষশত বাংলা নববর্ষের বৈশাখি মেলায়।

নীনা হামিদ

হলেন একজন বাংলাদেশী লোক সঙ্গীতশিল্পী। তিনি তার *"আমার সোনার ময়না পাখি"* এবং *"যে জন প্রেমের ভাব জানে না"* গানের জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসঙ্গীতে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ১৯৯৪ সালে একুশে পদকে ভূষিত করে।

প্রারম্ভিক জীবন[সম্পাদনা]

নীনা হামিদ এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার এবং মাতা সফরুন নেছা। ভাইবোনের মধ্যে নীনা সবার ছোট। তার বড় ভাই মোজাম্মেল হোসেন, এবং বড় দুই বোন রাহিজা খানম ঝুনু ও রাশিদা চৌধুরী রুনু। নীনাদের পৈতৃক বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার নওদা গ্রামে। কিন্তু সেখানে তাদের যাতায়াত ছিল না। তার বাবা পুলিশ অফিসার হলেও সংস্কৃতিমনা ছিলেন এবং চেয়েছিলেন ছেলেমেয়েরা সংস্কৃতি চর্চা করুক।[১]

নীনার সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয় নিখিল দেবের কাছে। তখন প্রতিবছর তার স্কুলে প্রধান শিক্ষিক বাসন্তী গুহ গানের প্রতিযোগিতায় তার নাম লেখাতেন এবং তার নাম দেন "কোকিল"। তার বড় বোন আফসারী খানম সুরকার আবদুল আহাদের কাছে গানের তালিম নিতেন। আহাদ একদিন নীনার কন্ঠ শুনে মুগ্ধ হন এবং তাকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের তালিম দেন।[২] পরে ১৯৫৬ সালে নীনা ধ্রুপদী সঙ্গীতে তালিম নিতে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ভর্তি হন। একই সাথে তার বড় ভাই মোজাম্মেল হোসেন সেতার, বড় বোন ঝুনু নৃত্য এবং রুনু রবীন্দ্র সঙ্গীত বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে নীনা গান শিখেন ওস্তাদ বারীণ মজুমদার ও বিমল দাসের কাছে।[১]

সঙ্গীত জীবন[সম্পাদনা]

তিনি আবদুল আহাদের মাধ্যমে নিয়মিত বেতারে খেলাঘরের অনুষ্ঠানে ধ্রুপদী গান গাইতেন। স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামে তিনি গান গেয়েছেন নীলুফার ইয়াসমীন, ওমর ফারুক ও হোসনা ইয়াসমীন বানুর সাথে। একদিন মানিকগঞ্জের গীতিকার ও সুরকার ওসমান খান তাদের বাড়িতে আসেন তার মেঝো বোন রুনুকে দিয়ে এইচএমভি কোম্পানির একটা গান করানোর জন্য। রুনু রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। তিনি তার প্রস্তাবে না করলে নীনা এই সুযোগটা গ্রহণ করেন এবং ঐ গানটি গাওয়ার আবদার করেন। ওসমান খান রাজি হলেন এবং তাকে দিয়ে সেই গানের রেকর্ডিং করালেন। সেই গানের দোতারায় ছিলেন কানাইলাল শীল, বাঁশিতে ধীর আলী মিয়া, তবলায় বজলুল করিম, একতারায় যাদব আলী। *"কোকিল আর ডাকিস না"* শিরোনামের রেকর্ডটি বের হলে গানটির প্রচুর কাটতি হয়।[২] এর পর রেকর্ড করা হয় "রূপবান পালা"। এই পালার সুরকার ছিলেন খান আতাউর রহমান। এই পালার *"ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো"*, *"শোন তাজেল গো"*, *"সাগর কূলের নাইয়া"* গানগুলো জনপ্রিয় হল। সেখান থেকে নির্মাণ করা হয় *রূপবান* (১৯৬৪) চলচ্চিত্র। ছবিটি ব্যাপক সারা ফেলে। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গানগুলোর হল - *"আমার সোনার ময়না পাখি"*, *"ওহ কি গাড়িয়াল ভাই"*, *"আগে জানিনারে দয়াল"*, *"আইলাম আর গেলাম"*, *"আমার বন্ধু বিনোদিয়া"*, *"আমার গলার হার"*, *"আমায় কি যাদু করলি রে"*, *"এমন সুখ বসন্ত কালে"*, *"যারে যা চিঠি লিইখা দিলাম"*, *"যোগী ভিক্ষা লয় না"*, *"ওরে ও কুটুম পাখি"*, *"উজান গাঙের নাইয়া"*।[১]

ব্যক্তিগত জীবন[সম্পাদনা]

নীনা এমএ হামিদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হামিদ একজন আধুনিক গানের শিল্পী।[৩] লোক ও আধুনিক ধারার নৃত্যশিল্পী ফারহানা চৌধুরী নীনা হামিদের ভাগনি।[৪]

সম্মাননা[সম্পাদনা]

- লোক সঙ্গীতে অবদানের জন্য একুশে পদক, ১৯৯৪[১]